তাওহীদ শির্ক ও তিন তাসবীহ্র হাকীকত

বইটির পটভূমি

রমযান মাসে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। 'তাওহীদ' সম্পর্কে কয়েক রমযানে আমি বিজ্ঞ আলেমগণের মুখে আলোচনা শুনেছি। কুরআন মাজীদের অগণিত উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা তাওহীদ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনায় শির্ক সম্বন্ধে কিছুই না বলায় আমি বিস্মিত হই। শিরকের উল্লেখ ছাড়া তাওহীদের ব্যাখ্যা কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না।

তাওহীদ সম্পর্কে আমি বেশ কয়েকটি বই ও প্রবন্ধ পড়েছি। তাওহীদ ফির্রুবূবিয়্যাহ, তাওহীদ ফিল উবূদিয়্যাহ, তাওহীদ ফিল উলূহিয়্যাহ ইত্যাদির বিশ্লেষণ পড়ে মনে হয়েছে, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার নিকট তাওহীদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরো সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) 'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীরে 'শির্ক'কে চমৎকার সহজবোধ্যভাবে পেশ করেছেন। গোটা কুরআনে অগণিত স্থানে শির্কের কথা আছে। মাওলানার তাফসীরের সব জায়গায়ই এ বিষয়ে টীকাও আছে; কিন্তু একটি টীকায় তিনি শির্কের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরেছেন। সূরা আন'আমের ১২৮ নং টীকায় যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তা একটু বিস্তারিতভাবে এ বইয়ে আলোচনা করেছি।

আশা করি, তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে স্বল্পশিক্ষিত লোকও এতে সহজবোধ্য ধারণা পাবেন। তাওহীদ ও শির্ক কোনো জটিল বিষয় নয়। ঈমানের মূলই হলো তাওহীদ। আর শির্ক তাওহীদেরই সম্পূর্ণ বিপরীত। শির্ক সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেলে তাওহীদ সম্বন্ধে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না।

নামাযের পর তিন তাসবীহ পড়ার যে শিক্ষা রাসূল (স) দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা হয়েছে, তাওহীদের ধারণাকে মন-মগজে মযবুত করাই এর আসল উদ্দেশ্য। তাই তিন তাসবীহ্র হাকীকতও তাওহীদ ও শির্কের সাথে শামিল করা হলো। উল্লেখ্য, তিন তাসবীহ'র হাকীকত অংশটি ১৯৯২ সালে জেলখানায় রচিত ও অক্টোবরে মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত।

পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সহজবোধ্য করার উদ্দেশে মীর লুৎফুল কবীর সাদী যথেষ্ট সময় ব্যয় করে বইটির ভাষায় বেশ কিছু সংযোজন করেছেন। এ জন্য তার প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাই।

গোলাম আযম
১৫ আগস্ট, ২০০৬

সূচিপত্র

তাওহীদ ও শির্ক
শির্ক মানে কী?
কীভাবে শরীক করে?
শির্ক ফিয্যাত
শির্ক ফিস্সিফাত
এ গুণের ব্যাপারে কিভাবে শির্ক করা হয়?
শির্ক ফিল হুকূক
শির্ক ফিল ইখতিয়ারাত
মুসলিম জাতির মধ্যে শির্কের বিস্তার
তাওহীদের হাকীকত
তিন তাসবীহ্‌র হাকীকত
সুবহানাল্লাহ
সুবহানাল্লাহ'র হাকীকত
কুরআনে 'সুবহানাল্লাহ' শব্দটির ব্যবহার
আলহামদুলিল্লাহ'র হাকীকত
আল্লাহু আকবারের হাকীকত
তিন তাসবীহ পড়ার সময়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

তাওহীদ ও শির্‌ক

তাওহীদ (تَـوْحِـيْـدٌ) শব্দের অর্থ হলো একত্ববাদ বা অদ্বিতীয়তাবাদ। আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সাথে কোনো দিক দিয়েই অন্য কোনো সত্তা শরীক নেই। তাঁর সাথে অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করার চেয়ে বড় গুনাহ আর হতে পারে না। তাই কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই শির্‌ক খুবই বড় যুলুম।

কুরআনে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সূরা নিসার ৪৮ ও ১১৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ কেবল শির্‌কের গুনাহই মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে, তা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করে দেন।

সূরা মায়িদার ৭২ নং আয়াতে তিনি আরো বলেছেন,

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। দোযখই তার ঠিকানা।

তাওহীদ ও শির্‌ক একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন– আলো ও অন্ধকার। একটির সাহায্যে অপরটিকে সহজে চেনা যায়। আলোর সবচেয়ে স্পষ্ট ও সহজ সংজ্ঞা হলো অন্ধকার না থাকা। অন্ধকারের সংজ্ঞা হলো আলো না থাকা। ঠিক তেমনি তাওহীদ মানে শির্‌ক নেই, আর শির্‌ক মানে তাওহীদ নেই। তাই শির্‌ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হলে তাওহীদকে বুঝতে কষ্ট হয় না।

শির্‌ক মানে কী?

শির্‌ক মানে শরীক করা। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সত্তার শরীক করাকেই শির্‌ক বলা হয়।

যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না সে কাফির। যে শির্‌ক করে সে আল্লাহকে অবিশ্বাস করে না। সে আল্লাহকে অবশ্যই বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকেও শরীক করে। যে শির্‌ক করে তাকে মুশরিক বলা হয়।

কীভাবে শরীক করে?

আল্লাহর সাথে কেমন করে বা কিভাবে অন্য সত্তাকে শরীক করা হয়, তা জানতে পারলেই শির্‌ককে সহজে বোঝা যাবে। চার রকমে আল্লাহর সাথে অন্য সত্তাকে শরীক করা হয়। সে হিসেবে শির্‌ক চার প্রকার। যথা–

১. শির্‌ক ফিয্‌যাত

আল্লাহর যাত বা সত্তার সাথে শরীক করা। হযরত ঈসা (আ)-কে খ্রিস্টানরা এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে বলে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে তারা হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মারইয়াম (আ)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে মনে করে। নাঊযুবিল্লাহ! কুরআনে বলা হয়েছে, আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা মনে করত। এভাবেই আল্লাহর সত্তার সাথে অন্যকে শরীক করা হয়।

অন্যান্য মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীদেরকে ঈশ্বরের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। জনগণের অন্ধভক্তির ভিত্তিতে ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো রাজপরিবার আল্লাহর বংশধর বা দেবত্ব দাবি করে থাকে। এ কথা যারা স্বীকার করে নেয় তারা শির্‌ক করল।

২. শির্‌ক ফিস্‌সিফাত

আল্লাহর গুণাবলির সাথে শরীক করা। আল্লাহর এমন কতক গুণ আছে, যা শুধু তাঁর মধ্যেই আছে বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। ঐসব গুণের অধিকারী অন্য কাউকে মনে করলে শির্‌ক ফিস্‌সিফাত বলে গণ্য হবে। যেমন–

ক. 'আলিমুল গাইব (عَالِمُ الْغَيْبِ) বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। তিনি যতটুকু ইলম রাসূল (স)-কে দিয়েছেন, এর অতিরিক্ত জ্ঞান রাসূলেরও নেই। একমাত্র আল্লাহই عَلِيْمٌ (সকল ইলমের অধিকারী) خَبِيْرٌ (সকল কিছুরই খবর রাখেন), سَمِيْعٌ (সব কিছু শুনেন), بَصِيْرٌ (সব কিছু দেখেন)। সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই কাছে আছে। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাকে যেটুকু দান করেন, এর অতিরিক্ত কোনো জ্ঞান অন্য কারো কাছে নেই।

এ গুণের ব্যাপারে কিভাবে শির্‌ক করা হয়?

ভণ্ড আধ্যাত্মিক নেতারা এ ধারণা দিয়ে থাকে যে, ইলহাম ও কাশ্‌ফের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারে। এ রকম মিথ্যা ধারণা দিয়ে তারা নিজেরা শির্‌কে লিপ্ত, যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তারাও শির্‌কে লিপ্ত।

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনি অন্যের মনের কথা জানতে পারেন। 'মেঘনা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য পড়েছি। তিনি বলেছেন, আমি অমুক পীর সাহেবের দরবারে গেলাম। তার কাছ থেকে কিছু বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করার ইচ্ছা করলাম। হুযুর আমার দিকে তাকালেন এবং আমার মনের প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে থাকলেন। বুঝতে পারলাম, তিনি আমার মনের কথা আগেই জানতে পেরেছেন। এ ধরনের বক্তব্যই শির্‌ক।

কতক লোক দাবি করে যে, তাদের নিয়ন্ত্রণে জিন আছে। অজ্ঞাত খবর জিন যোগাড় করে আনে। এদেরকে বিশ্বাস করা শির্‌ক।

খ. একমাত্র আল্লাহই সুবহান বা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র। মানুষ সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কাজেই কোনো মানুষকে এমন পবিত্র সত্তা বলে বিশ্বাস করা শির্‌ক।

৩. শির্‌ক ফিল হুকূক

যা একমাত্র আল্লাহর হক বা অধিকার, তাতে অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করা। আল্লাহর বান্দাহদের উপর তাঁর বিশেষ কতক অধিকার রয়েছে। ঐসব অধিকারের কোনোটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মনে করা শির্‌ক। যেমন–

ক. কারো সামনে রুকূ' ও সিজদা করা, বুকে হাত বেঁধে বা হাত জোড় করে ভক্তিসহ দাঁড়ানো একমাত্র আল্লাহর অধিকার।

খ. নিয়ামতের শুকরিয়া ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কারো উদ্দেশ্যে কোনো সম্পদ নযরানা দেওয়া, পশু কুরবানী করা শুধু আল্লাহর অধিকার।

গ. প্রয়োজন পূরণ ও সংকট দূর করার জন্য মান্নত করা, বিপদাপদে সাহায্যের জন্য ডাকা এবং ঐ উদ্দেশ্যে পূজা-অর্চনা, সম্মান ও মর্যাদা দান করা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকার। তাই মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা, সূর্যপূজা. বৃক্ষপূজা ইত্যাদি সবই জঘন্য শির্‌ক।

ঘ. কাউকে এমন ভালোবাসার পাত্র মনে করা, যার জন্য অন্যসব ভালোবাসাকে উৎসর্গ করে দেওয়া একমাত্র আল্লাহর অধিকার।

ঙ. কাউকে এমন ভয় করা, যা শুধুমাত্র আল্লাহকে করা উচিত। গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় করতে থাকা শুধু আল্লাহর অধিকার।

চ. কারো শর্তহীন আনুগত্য করা, তার হুকুমকে ভুল ও নির্ভুলের মাপকাঠি বা মানদণ্ড মনে করা শির্‌ক। কারণ, এটি একমাত্র আল্লাহর হক।

ছ. আসল আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহর সনদ থাকলে ঐ পরিমাণ অন্য কারো আনুগত্য করা জায়েয; কিন্তু আল্লাহর সনদ ছাড়া কারো আনুগত্য করা শির্ক।

উপরিউক্ত অধিকারসমূহ ও এ জাতীয় যত অধিকার তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, এর কোনোটি অন্য কোনো সত্তার আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক।

৪. শির্ক ফিল ইখতিয়ারাত

আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করা। যেসব ক্ষমতা বা ইখতিয়ার শুধু আল্লাহর বলে নির্ধারিত সেসব ক্ষেত্রে অন্য কারো হিস্যা আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে আল্লাহর যে ক্ষমতা রয়েছে, তাতে কেউ শরীক নয়। কেউ শরীক আছে বলে মনে করা শির্ক। যেমন–

ক. হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সীমানা নির্ধারিত করার ইখতিয়ার শুধু আল্লাহর। অর্থাৎ, আইন ও বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ। কোন্ কোন্ কাজ করা বাধ্যতামূলক ও কোন্ কোন্ কাজ করা নিষিদ্ধ, তা আইন দ্বারাই নির্দিষ্ট করা হয়। আইনই হালাল-হারাম নির্ধারণ করে। আল্লাহ এ ক্ষমতা রাসূল (স)-কেও দেননি। এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

অবশ্য আল্লাহর আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করার অধিকার মানুষের আছে; কিন্তু আল্লাহর আইনের বিরোধী কোনো আইন রচনার অধিকার কারো নেই।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে আইন চালু রয়েছে তা আল্লাহর আইন নয়। যারা এ আইন বদলিয়ে আল্লাহর আইন কায়েম করার চেষ্টা করছেন তারা প্রমাণ করছেন যে, বর্তমান আইনকে তারা বৈধ বলে মেনে নেননি। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বলে বিশ্বাস করেন না। তাই তারা এ শির্ক থেকে মুক্ত। কিন্তু যারা ইংরেজদের রেখে যাওয়া আইনের বদলে আল্লাহর আইন কায়েমের চেষ্টা করেন না তারা কি বর্তমান আইনকে মেনে নিয়েছেন বলে প্রমাণ হয় না? তাহলে তারা কি শির্ক থেকে বেঁচে আছেন বলা যায়? আল্লাহর আইন কায়েমের চেষ্টা করা ফরয বলে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত যে শির্ক থেকে বাঁচা যায় না, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

খ. বিশ্বের সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

গ. অভাব দূর করা প্রয়োজন পূরণ করা, সঙ্কটমোচন করা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ার। তাই এসবের জন্য একমাত্র তাঁরই সাহায্য চাইতে হবে, তাঁরই উপর ভরসা করবে, তাঁরই নিকট আশা করবে।

ঘ. আল্লাহ মানুষকে কিভাবে, কোন্ কাজে ও কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে এর বিধান দেওয়ার ইখতিয়ার শুধু তাঁরই। তাঁর বিধানকেই চূড়ান্ত মনে করতে হবে।

ঙ. সন্তান দান করা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ার। আজমীরে খাজাবাবার মাযারে ও বাগদাদে বড় পীরের মাযারে বা অন্য কোনো মাযারে গিয়ে সন্তান চাওয়া সুস্পষ্ট শির্ক।

চ. রোগ দেওয়া ও রোগ ভালো করা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ার।

ছ. কারো ভাগ্য গড়া বা ভাঙার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর।

জ. অলৌকিকভাবে কাউকে লাভবান করা বা ক্ষতিগ্রস্ত করা, কারো অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করা, কাউকে সাহায্য করা, কারো হেফাযত করা ইত্যাদি সবই শুধু আল্লাহর ইখতিয়ার।

ঝ. কারো দু'আ শোনা ও কবুল করা এবং কারো গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর।

এ সবের কোনোটি করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মনে করা শির্ক।

মুসলিম জাতির মধ্যে শির্কের বিস্তার

শির্ক সম্পর্কে উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা অতি সহজেই এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাই। আমরা মুসলিমদের মধ্যে শির্ক ফিয্যাত নেই বলে মনে করি; কিন্তু বাকি তিন প্রকার শির্ক ব্যাপকভাবেই আছে। বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার শির্ক সবচেয়ে বেশি চালু আছে।

আমাদের দেশে মাযার ও কবরকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বেশি শির্ক হয়ে থাকে। ধূর্ত ধর্ম-ব্যবসায়ীরা মানুষের দুর্বলতার সুযোগে জনগণের মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে, কবরে মোমবাতি দিলে আপদ-বিপদ দূর হয়, মাযারে শিরনি দিলে সওয়াব হয়, পীরের আস্তানায় গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি দিলে মনের আশা পূরণ হয়।

আমাদের দেশ থেকে অনেক ধনী ও শিক্ষিত লোক পর্যন্ত সন্তানলাভ, রোগ ও বিপদমুক্তির আশায় আজমীর শরীফে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র)-এর মাযারে গিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করে। তাদের বিশ্বাস, খাজাবাবা সুপারিশ করলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের আশা পূরণ করবেন। মাযারের স্বার্থপর খাদেমরা ধারণা দেয় যে, খাজাবাবার দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। এমনকি জনগণের মনে এ ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গানও রচনা করা হয়েছে।

অথচ কুরআন ও হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, মাযারে যাদের কবর তারা যত বড় আলেম, বুযুর্গ, সুফি ও সাধকই হোন, তাঁদের কেউ অন্য কারো কোনো উপকার করার সামান্য ক্ষমতাও রাখেন না। তাঁদের কাছে কিছু চাওয়া অর্থহীন।

মাযার যিয়ারতকে বিরাট সওয়াবের কাজ বলে বিশ্বাস করা হয়; কিন্তু এ কথার পক্ষে কোনো সনদ নেই। সহীহ হাদীস অনুযায়ী কবর ও মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কবরবাসীর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা ও নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা।

অনেক বড় বড় সড়কের পাশে মাযার দেখা যায়। সড়ক তৈরি হওয়ার আগে মাযার না থাকলেও কেমন করে মাযার গড়ে ওঠে? উত্তরবঙ্গে মাযারের পাশে বাস থামাতে দেখেছি। যাত্রীরা মাযারের দানবাক্সে টাকা-পয়সা দেয়। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেন থামালে? জবাবে ড্রাইভার বলল, না থামালে গাড়ি বিকল হয়ে যাবে, না হয় দুর্ঘটনা ঘটবে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের মাঝে এ ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাওহীদের হাকীকত

তাওহীদ মানে আল্লাহর যাত, সিফাত, হুকূক ও ইখতিয়ারাত সম্পর্কে সঠিক ইলম হাসিল করে এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সত্তাকে কোনো দিক দিয়ে শরীক মনে না করা। শির্কমুক্ত না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট মুশরিক বলে গণ্য হবে। শির্কের গুনাহ আল্লাহ মাফ করেন না। তাই দোযখ থেকে রক্ষা পেতে হলে শির্ক থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। শির্কের সামান্য আশঙ্কা থাকলেও তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

শির্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর তাওহীদের হাকীকত বা মর্মকথা বোঝার জন্য কি আরো আলোচনার দরকার আছে?

তাওহীদের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যায়; কিন্তু তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট মনে করছি।

তাওহীদের পক্ষে কুরআনের আয়াতে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে, সেগুলোকে তাওহীদের সংজ্ঞা বলা চলে না। সঠিক সংজ্ঞা ঐটাই, যা শির্কের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, তাওহীদও চার প্রকার। যথা–

১. তাওহীদ ফিয্যাত– আল্লাহ তাঁর সত্তার দিক দিয়ে একক ও অদ্বিতীয়।
২. তাওহীদ ফিস্সিফাত– গুণাবলির দিক দিয়েও তিনি একক ও অদ্বিতীয়।
৩. তাওহীদ ফিল হুকূক– অধিকারের দিক দিয়েও তিনি একক ও অদ্বিতীয়।
৪. তাওহীদ ফিল ইখতিয়ারাত– ক্ষমতার দিক দিয়েও তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

তিন তাসবীহ'র হাকীকত

তিন তাসবীহ মানে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। বহু সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল (স) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ তিনটি তাসবীহ পড়ার বিভিন্ন রকম ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কোনো হাদীসে একেকটি তাসবীহ ৩৩ বার করে পড়ার পর (৩×৩৩) ৯৯ সংখ্যার সাথে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ,

লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পড়ে ১০০ সংখ্যা পূরণ করতে বলা হয়েছে। আবার অন্য হাদীসে প্রথম ও দ্বিতীয় তাসবীহ ৩৩ বার করে ও শেষটি ৩৪ বার পড়তে আদেশ করা হয়েছে। ঘুমানোর সময় ৩৩+৩৩+৩৪ বার এ তিন তাসবীহ পড়ার কথা হাদীসে আছে।

মুসল্লীদের সবাই এ তিন তাসবীহর কথা জানেন এবং অনেকেই নিয়মিত পড়েন। কিন্তু এ তিনটি তাসবীহ মুখে পড়ার সময় মনে মনে এর মর্মকথা কীভাবে খেয়াল করতে হবে, এ বিষয়ে চর্চার বড়ই অভাব। শুধু ফযীলত ও সওয়াবের চর্চাই প্রচলিত। হাকীকতের চর্চা নেই বললেই চলে। নামাযেরও একই দশা। মুখে নামাযে যা পড়া হয়, অন্তরে তখন কোনো খেয়াল করতে হবে কি না, সে শিক্ষা সাধারণত নামায শিক্ষার বইয়ে নেই। নামায শেখানোর সময় তা শেখানো হয় না। তাই জীবন্ত নামায থেকে আমরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছি।

এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কালেমা তাইয়েবার অর্থ না বুঝে শুধু শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই ঈমান পয়দা হয় না। 'ইকরার বিল্‌লিসান'-এর সাথে সাথে 'তাসদীক বিল্‌জিনান' ছাড়া ঈমান হয় না। অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং মনে এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে হবে। তবেই ঈমান আনা হলো বলে স্বীকার করা হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে, মনে সত্যতা স্বীকার করতে হলে কালেমার অর্থ বুঝতে হবে কি না? কালেমা মানেই কথা। আর যা বোঝা যায় না, তা আওয়াজ হতে পারে; কথা হতে পারে না।

তাই যখন কেউ মুখে কালেমা উচ্চারণ করে এবং অন্তরে এর অর্থ বুঝে কবুল করে, তখন সে মুমিন বলে গণ্য হয়। ময়না পাখিও কালেমা উচ্চারণ করতে পারে; কিন্তু তার অর্থ বোঝার সাধ্য নেই বলে সে মুমিন হতে পারে না।

হাদীসে আছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্রেষ্ঠ যিক্‌র। কিন্তু এর অর্থ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলে যিক্‌র বলে গণ্য হতে পারে না। যিক্‌র মানে স্মরণ করা। স্মরণ করার কাজটা তো মনের। সুতরাং মনে এর অর্থের খবর না থাকলে শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই তা যিক্‌রের দাবি পূরণ করে না।

তিন তাসবীহ-এর ব্যাপারেও এ কথা সত্য। মুখে এ তাসবীহগুলো উচ্চারণ করার সময় মনে খেয়াল করতে হবে যে, আমি মুখে কী বলছি। সুবহানাল্লাহ শব্দটির দিকে নয়, এর মর্মকথার দিকেই খেয়াল রেখে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। এখন একেকটি তাসবীহ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

সুবহানাল্লাহ

এর শাব্দিক অর্থ হলো আল্লাহ পবিত্র। এখানে পবিত্র কথাটির মর্ম কী? কী অর্থে আল্লাহকে পবিত্র বলা যায়। কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় 'সুবহানাল্লাহ' বা 'সুবহানাল্লাহ তাআলা' উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে বা পরে এমন কথা আছে, যা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শির্‌কের বিরুদ্ধে তাওহীদের ঘোষণা হিসেবেই সুবহানাল্লাহ বলা হয়েছে। অল্প কয়েকটি নমুনা থেকেই এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় :

১. সূরা বাকারা (আয়াত : ১১৬) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهٗ

২. সূরা আন'আম (আয়াত : ১০০) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

৩. সূরা ইউনুস (আয়াত : ১৮) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

৪. সূরা ইউসুফ (আয়াত : ১০৮) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

৫. সূরা আম্বিয়া (আয়াত : ২২) سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

৬. সূরা সাফ্‌ফাত (আয়াত : ১৮০) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

৭. সূরা তূর (আয়াত : ৪৩) سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

৮. সূরা নাহ্‌ল (আয়াত : ৫৭) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهٗ

এ আটটি আয়াতের অনুবাদ :

১. এরা বলে যে, আল্লাহ সন্তান ধারণ করেন। তিনি তা থেকে পবিত্র।

২. এরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যে বিবরণ দেয়, তা থেকে মহান আল্লাহ পবিত্র।

৩. এরা যেসবকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করে, মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

৪. আল্লাহ পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের কেউ নই।

৫. এরা যে বিবরণ দেয়, তা থেকে আরশের প্রভু আল্লাহ পবিত্র।

৬. এরা যে বিবরণ দেয়, তা থেকে (হে রাসূল!) ইয্যতের মালিক আপনার রব পবিত্র।

৭. এরা যেসবকে শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

৮. এরা বলে যে, আল্লাহর মেয়ে আছে। তিনি তা থেকে পবিত্র।

এ সব ক'টি আয়াতের মর্মকথা একই। এর সারকথা হলো– আল্লাহ পাক বলেন, (এখানে পাক মানে পবিত্র) আমার সাথে মানুষ যেসবকে শরীক করে বা আমার গুণাবলি সম্পর্কে তারা যে বিবরণ দেয়, তা থেকে আমি পবিত্র।

সুবহানাল্লাহ'র হাকীকত

'সুবহানাল্লাহ' আসলেই তাওহীদ বিশ্বাসের স্পষ্ট ঘোষণা এবং শির্ককে অস্বীকার করার দৃঢ় শপথ। অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহ মুখে উচ্চারণ করার সময় মনে মনে এ খেয়ালই করতে হবে যে, আমার আল্লাহ সব রকম শির্ক থেকে পাক। আর আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এ পবিত্রতা ঘোষণার আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। যখন কোনো বস্তু বা সত্তাকে কোনো দিক দিয়ে (ঐ ৪ রকমের কোনো এক বা একাধিক দিক দিয়ে) আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মধ্যে দুর্বলতা, কমতি ও ত্রুটি আছে বলে স্বীকার করা হয়। আল্লাহর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে মনে করলে আল্লাহকে মানুষের মতোই দুর্বল মনে করা হয়। মানুষ যেমন স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দুর্বল আল্লাহও তেমনি। মানুষ যেমন নিজের সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, তেমনি আল্লাহরও দরকার হয়। নাউযুবিল্লাহ!

গায়েবী ইলম, সর্বত্র হাযির-নাযির ইত্যাদি গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আছে মনে করলে তাকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ করা হয়। এভাবে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সমান মর্যাদা দেওয়ার ফলে আল্লাহকে হেয় করা হয়।

তেমনি আল্লাহর হক অন্যকে দিলে এবং আল্লাহর ক্ষমতা অন্যের মধ্যে আছে মনে করলে আল্লাহর মর্যাদাহানি করা হয়।

সুবহানাল্লাহ বলে এ কথাই ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ সব রকম দুর্বলতা, ত্রুটি ও কমতি থেকে পবিত্র। অন্য কেউ কোনো দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ হওয়া থেকেও তিনি পবিত্র।

(নোট : একজন হাক্কানী পীর, যার মতো নিঃস্বার্থ ও উদার আলেম আমি কমই দেখেছি, তার মুরীদদের জন্য লিখিত হেদায়াতে আমি পড়েছিলাম, সুবহানাল্লাহর যিক্র করার সময় মনে মনে যেন খেয়াল করা হয় যে, আল্লাহই একমাত্র পবিত্র, আমি পায়খানার কীট থেকেও বেশি অপবিত্র। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে ঘোষণা করার পর এ জাতীয় শিক্ষা দেওয়া কি ঠিক? সুবহানাল্লাহ যে তাওহীদের ঘোষণা, সে কথা জানা থাকলে এমন অদ্ভুত শিক্ষা দেওয়া হতো না।)

কুরআনে 'সুবহানাল্লাহ' শব্দটির ব্যবহার

কুরআন মাজীদে 'সুবহান' শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে এ শব্দটি শির্কের প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি, সেখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার মর্মও একই দাঁড়ায়। যেমন– সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে রাসূল (স)-কে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় এক রাত ভ্রমণ করানোর কথা শুরু করা হয়েছে 'সুবহান' শব্দ দিয়ে– سُبْحَانَ الَّذِىٓ اَسْرٰى এখানে যে অর্থে 'সুবহান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে

আল্লাহর অসীম ক্ষমতাই বোঝায়। অর্থাৎ, এ কাজটি এমন এক সত্তার পক্ষেই সম্ভব, যাঁর কোনো দিক দিয়েই কোনো দুর্বলতা, অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নেই। এ অর্থে কুরআন মাজীদে 'সুবহান' শব্দটি বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এতেও তাওহীদের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, এসব ব্যাপারে আল্লাহ একাই ক্ষমতার অধিকারী; অন্য কেউ এতে শরীক নেই।

সূরা যুখরুফ-এর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا

অর্থাৎ, পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি এটা আমাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছেন।

সূরা ইয়াসীন-এর ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

অর্থাৎ, পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট সবকিছুই পয়দা করেছেন।

এ দুটো আয়াতে তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, এ সবই একমাত্র আল্লাহর কাজ। এককভাবে আল্লাহই এসব করেছেন। এর মধ্যে অন্য কোনো সত্তা শরীক নেই।

আলহামদুলিল্লাহ'র হাকীকত

'আলহামদুলিল্লাহ্'র শাব্দিক অর্থ– সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। 'হাম্দ' মানে প্রশংসা। 'আলহাম্দ' মানে সবটুকু প্রশংসা। অর্থাৎ, প্রশংসা শুধু আল্লাহরই জন্য। সৃষ্টিজগতে যেখানে যত গুণ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ দেখা যায়, এসবের যিনি স্রষ্টা, আসল প্রশংসা তাঁরই। গাছটি বা পাখিটি খুব সুন্দর। মানুষটি খুবই সৎ ও ভালো। ফলটি খুবই সুস্বাদু। ফুলটি বড়ই সুগন্ধিযুক্ত। এসব গুণের অধিকারীদের কি কোনো বাহাদুরি আছে? এসব গুণ সৃষ্টি যিনি করেছেন, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। প্রশংসা পাওয়ার হক একমাত্র তাঁরই। প্রশংসা, গুণাবলি ও তাঁর সৃষ্টিতে অন্য কেউ শরীক নেই।

আল্লাহ তাআলার প্রশংসার আসল উদ্দেশ্য তাঁর প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করা। তিনি যত নিয়ামত দান করেছেন, এর শুকরিয়া আদায় করার এ ভাষাও তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন। যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে শুকরিয়ার জযবা-ই প্রকাশ পায়। কুরআনে যে সূরাটি পূর্ণ সূরা হিসেবে প্রথম নাযিল হয়েছে, তা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়েই শুরু করা হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ যিক্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দোআ আলহামদুলিল্লাহ'।

তাই তিন তাসবীহ পড়তে গিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ার সময় মনে খেয়াল করতে হবে যে, তাওহীদকে বুঝে ঈমান আনার তাওফীক যিনি দিলেন, তাঁর প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত গুনে শেষ করার ক্ষমতা যে মানুষের নেই, সে কথা কুরআনে কয়েকবার ঘোষণা করা হয়েছে। এসব নিয়ামতের মধ্যে দীন ও ঈমান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ দান করে। তাই এর জন্য শুকরিয়া সবচেয়ে বেশি হতে হবে।

সূরা আ'রাফের ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বেহেশতবাসীরা সেখানকার অফুরন্ত ও অগণিত নিয়ামত পেয়ে নিজেদের বাহাদুরি প্রকাশের পরিবর্তে দীনের পথে হেদায়াত দান করার জন্য এ ভাষায় আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়াত করেছেন। তিনি যদি হেদায়াত না করতেন, তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না।

সূরা ইউনুসের ১০ নং আয়াতে বেহেশতবাসীদের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, তাদের প্রতিটি কথাই শেষ হবে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে।

আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ভোগ করার পর এবং তাঁর কোনো অনুগ্রহ পেলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেই শুকরিয়া আদায় করার শিক্ষা রাসূল (স) দিয়েছেন। যেমন–

খাওয়ার পর– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম বানায়েছেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

ঘুম থেকে ওঠার পর– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী)

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আলহামদুলিল্লাহ' কথাটির আসল উদ্দেশ্যই আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করা।

রাসূল (স) বলেছেন– اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ ـ مَا شَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهٗ

অর্থাৎ, 'আলহামদু' হলো বড় শুকরিয়া। যে বান্দাহ আল্লাহর প্রশংসা করল না, সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করল না।

আল্লাহু আকবারের হাকীকত

তিন তাসবীহর তৃতীয়টি হলো 'আল্লাহু আকবার'। এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহই সবচেয়ে বড়'। সর্বপ্রথম রাসূল (স)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে সূরা মুদ্দাস্‌সিরে যেসব হেদায়াত দিয়েছেন, তার প্রথম কাজই হলো وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (আপনার রবের বড়ত্ব প্রচার করুন।) সূরার শুরুতে 'হে রাসূল! আপনি উঠুন ও কর্মতৎপর হোন এবং জনগণকে সতর্ক করুন'– এ ক'টি কথা বলার পরই রাসূল (স)-কে আল্লাহ তাআলা যে কাজটি করার নির্দেশ দিলেন, তা-ই হলো 'আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করুন'। এ কাজটির মাধ্যমেই মানুষকে সাবধান করুন যে, আল্লাহকে অবহেলা করে মানুষ কিছুতেই জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। আল্লাহকে ভুলে মনগড়া জীবন যাপন করার পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করুন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা। এ কারণেই চিরস্থায়ী আল্লাহর গোলামদের প্রথম ও প্রধান স্লোগানই হলো 'আল্লাহু আকবার'। প্রতিদিন পাঁচ বার আযান দেওয়ার সময়ও প্রথম ডাক-ই হলো 'আল্লাহু আকবার'।

আল্লাহর দরবারে নামাযের উদ্দেশ্যে হাযির হয়ে 'আল্লাহু আকবার' দিয়েই প্রথম মনিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং রুকূ' ও সিজদায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে এ কথাই স্বীকার করা হয় যে, হে আল্লাহ! তোমাকেই শুধু বড় মনে করি বলে তোমার নিকট নত হচ্ছি ও আত্মসমর্পণ করছি। এভাবে মুমিনের চালিকাশক্তি ও প্রেরণার উৎসই হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার'।

মুমিনের 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করার সময় মনে যে কথা খেয়াল করতে হবে, এর দুটো দিক রয়েছে– একটি তার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের দিক, আরেকটি হচ্ছে সমাজে আল্লাহর বড়ত্ব কায়েম করার দিক। ব্যক্তিগত দিক দিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, দুনিয়ার সব সম্পর্ক আল্লাহর খাতিরে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কোনো কিছুকেই আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসব না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করব না। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে মুমিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক।

আর সমাজে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করার দিক হলো ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন। সমাজ ও রাষ্ট্রে যদি আল্লাহর আইন কায়েম না হয়, তাহলে বাস্তবে আল্লাহর বড়ত্ব বহাল থাকতে পারে না। মানুষের মনগড়া আইনের অধীনে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করার মানে হলো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা। বাতিল জীবনব্যবস্থার অধীনে বাতিল শক্তি আল্লাহকে মানতে যতুটুকু অনুমতি দেয়, ততটুকু মেনে চলার দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করা হয় না। বাতিল সমাজব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান কায়েমের চেষ্টা না করে আযান ও নামাযে যত জোরেই 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করা হোক, তাতে আসলে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ পায় না।

তাই আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এবং সমাজে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বড়ত্ব কায়েমের জযবা নিয়েই 'আল্লাহু আকবার' তাসবীহ জপতে হবে।

তিন তাসবীহ পড়ার সময়

প্রতি নামাযের পর এবং ঘুমানোর সময় এ তিনটি তাসবীহ পড়ার তাকীদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এর এত রকম ফযীলত রাসূল (স) বর্ণনা করেছেন। এ তাসবীহগুলোর হাকীকতের দিকে খেয়াল রেখে পড়া হলে মুমিনের জীবনে তার ঈমান কখনো দুর্বল হবে না এবং বাতিলের মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সে দ্বিধা করবে না।

তিন তাসবীহ পড়ার সময় যে খেয়াল মনে রাখতে হবে, তা একসাথে সাজিয়ে বলছি–

'সব রকম শির্ক থেকে আমার মনকে পাক-সাফ করে 'সুবহানাল্লাহ' বলে আমার মা'বুদের পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাওহীদকে বুঝে-শুনে কবুল করছি।'

'যে মহান মনিব আমাকে শির্কমুক্ত খালেস তাওহীদের ওপর ঈমান আনার তাওফীক দিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তাঁর প্রতি আন্তরিক গভীর শুকরিয়া জানাচ্ছি।'

'সবশেষে 'আল্লাহু আকবার' বলে আমি এ সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমার জীবনে ও আল্লাহর জমিনে আমার আল্লাহর বড়ত্ব কায়েমের জন্য আমি আজীবন জিহাদ করব।'

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এবং ঘুমানোর সময় এ কথাগুলো খেয়াল রেখে তিন তাসবীহ পড়বে, সে কখনো তাওহীদের চেতনা, ঈমানের মূল্য ও ইকামাতে দীনের দায়িত্বের কথা ভুলবে না।

সমাপ্ত